আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ
বাংলাদেশ

IFI WATCH
BANGLADESH

বর্ষ ৪ সংখ্যা ২
মার্চ ২০০৭

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাণিজ্যসংস্থা সংক্রান্ত কার্যদল, বাংলাদেশ

কৃষি উদারীকরণ

কৃষক ও শস্যখাতের লোকসান

কৃষির বিরাষ্ট্রীয়করণ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কার্যত এককভাবেই কৃষি উৎপাদনের বিভিন্ন উপকরণ যেমন সার, বীজ, কীটনাশক ও সেচ-যন্ত্রপাতি আমদানি, সংগ্রহ ও বিতরণ-বিপণনের কাজগুলো করত। অন্যদিকে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সেচের পানি সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি নিষ্কাশনের কাজ দেখভাল করত। তবে আশির দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশ কৃষি উপকরণ সরবরাহ খাতে উদারীকরণ তথা বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু করে। এটি করা হয় কৃষিতে বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং বহির্বাণিজ্য উদারীকরণ মানে আমদানি পর্যায়ের শুল্ক হ্রাস করার মাধ্যমে। বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চাপে ক্রমান্বয়ে কৃষি খাতে ভর্তুকি হ্রাস ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সেবা-সুবিধা কমিয়ে আনার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষিতে দ্রুততর উদারীকরণ ঘটে।

বলা হয়েছিল যে কৃষি উদারীকরণের ফলে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষি খাত লাভজনক হবে। কিন্তু কৃষকের জীবন-জীবিকার ওপর আসলে এই উদারীকরণের কী প্রভাব পড়েছে তা বোঝার জন্য বাংলাদেশে প্রধান শস্যগুলোর উৎপাদন লাভজনক কি না তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে বিভিন্ন জাতের ধান ও গম উৎপাদন কার্যত আর লাভজনক হচ্ছে না। ১৯৮০-৮১ থেকে ২০০৫-০৬ সময়কালে তথ্য, পরিসংখ্যান পর্যালোচনা ও কিছু মাঠপর্যায়ের অনুসন্ধানের সঙ্গে মিলিয়ে যে গবেষণাটি সম্পন্ন করা হয়েছে, তাতে বেরিয়ে এসেছে যে আলোচ্য সময়কালে এই লাভজনক অবস্থা ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে ফসলের প্রাপ্তি-ব্যয় অনুপাত নির্ণয় করে এর প্রমাণ মিলেছে।

কৃষি উদারীকরণের বিষময়তা

বাংলাদেশের কৃষি খাতে উদারীকরণ ঠিক কবে থেকে শুরু হয়েছে তার দিন-তারিখ নির্দিষ্ট করে বলা কঠিন। তবে গত শতকের আশির দশকের শুরুর দিকে বিশ্বব্যাংকের দুটি প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকেই যে তা শুরু হয়েছে এমনটা বলা যায়। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক ১৯৭৯ সালে খাদ্যনীতির ওপর প্রথম প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে। এর বছর তিনেক পরে ১৯৮২ সালে 'বাংলাদেশ: খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভরতা ও ফসলের বৈচিত্র্যকরণ' শীর্ষক দ্বিতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। দুটো প্রতিবেদনেই বিশ্বব্যাংক উৎপাদন বাড়ানো ও খাদ্যশস্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের ওপর জোর দিয়ে কৃষি খাতে বাজার উদারীকরণের পরামর্শ দেয়। বাস্তবে প্রতিবেদন দুটি বাংলাদেশের কৃষি খাতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এরই মধ্যে অর্থাৎ আশির দশকের গোড়ার দিকে 'কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচি'র (স্যাপ) আওতায় বাংলাদেশের কৃষি খাতে সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়, যা নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চলে। এই কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলো হচ্ছে-

- কৃষি খাতে বিশেষ করে সারে ভর্তুকি হ্রাস/প্রত্যাহার, সার সরবরাহ-ব্যবস্থার বেসরকারীকরণ;
- আশির দশকের শেষদিকে বেসরকারিভাবে সেচ-যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার;
- ১৯৯৫ সালে বেসরকারি খাতে চালসহ খাদ্যশস্য আমদানির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার;
- কৃষি খাতে বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) মাধ্যমে সার আমদানি, বিক্রয় ও বিতরণ এবং সেচ কার্যক্রম ও বীজ বিতরণের দায়িত্ব ক্রমান্বয়ে সংকোচন;
- আশির দশকেই সরকারিভাবে খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন। পল্লী অঞ্চলে রেশন বন্ধ করে খাদ্য নিরাপত্তার নতুন কর্মসূচি কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) ও ভিজিডি (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) পরিচালনার নীতি গ্রহণ করা হয়;
- ১৯৯২ সালে জাতীয় বীজনীতি প্রবর্তন করে তাতে বীজ উৎপাদন বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। তবে ধানসহ পাঁচটি শস্য এককভাবে সরকারের হাতেই রেখে দেওয়া হয়।

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

সচিবালয়
উন্নয়ন অন্বেষণ / The Innovators
বাড়ি - ৪০/এ, সড়ক- ১০/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮০-২-৮১৫ ৮২৭৪
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮১৫ ৯১৩৫, ই-মেইল: info@unnayan.org ওয়েব: www.unnayan.org

কৃষি খাত উদারীকরণের আগে ভর্তুকি দিয়ে বিএডিসির মাধ্যমেই এককভাবে সার বিতরণ করা হত। এই ভর্তুকি-ব্যবস্থার ফলে ক্ষুদ্র ও গরিব কৃষকদের জন্য কম দামে সার কেনার সুযোগ ছিল। এ ছাড়াও বিএডিসির তত্ত্বাবধানে সমবায়ভিত্তিক মালিকানা ব্যবস্থায় কৃষকদের পানি-সেচের সুবিধা দেওয়া হত। এই ব্যবস্থায় সেচ কার্যক্রমের ব্যয় কম পড়ত বলে দরিদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা সহজেই সুযোগটি নিতে পারত। উদারীকরণ শুরুর আগে এ দেশে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) নামের রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাটি খুবই শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারত। ব্যবসায়ী-সিন্ডিকেটের কারণে বাজারে কোনো সমস্যা দেখা দিলে সেটি এড়াতে বা মোকাবেলায় টিসিবির মাধ্যমে সরকার হস্তক্ষেপ করতে বা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পারত।

ঐতিহাসিকভাবেই বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। যে দেশের মোট জনসংখ্যার ৭৬% বাস করে গ্রামাঞ্চলে। আবার গ্রামাঞ্চলের ৯০% মানুষ জীবিকার জন্য সরাসরি কৃষি খাত ও কৃষিসংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের ওপর নির্ভরশীল।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে সর্বাধিক কর্মসংস্থানের খাতটি হচ্ছে কৃষি। বিগত ২০০৫-০৬ অর্থবছরের তথ্য অনুযায়ী দেশের মোট কর্মসংস্থানের ৫১.৬৯%-ই হয়েছে কৃষি খাতে, যা ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে ছিল ৪৮.৭%। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের হিসাবে দেখা যায়, বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) কৃষি খাতের অবদান হচ্ছে ২১.৭৭%। গত শতাব্দীর সত্তর দশকের দিকে অবশ্য জিডিপিতে প্রায় অর্ধেকটারই জোগান আসত কৃষি খাত থেকে।

বাংলাদেশের জিডিপিতে একদিকে কৃষি খাতের অবদান কমলেও দারিদ্র্যের কারণে এই খাতের ওপর জনগণের নির্ভরতা বাড়ছে। সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্যের কারণেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। গরিবদের অন্যত্র কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকায় কৃষি খাতের ওপর চাপ বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে বেকারত্বও। যে হারে দারিদ্র্য বিমোচন হচ্ছে তা নগণ্যই বটে। এ অবস্থায় অন্যের তথা বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের প্রভাবে বাংলাদেশের নেওয়া উন্নয়ন কৌশল সত্যিকার অর্থে কতটা কাজে এসেছে তা নিয়ে খুব সহজেই প্রশ্ন তোলা যায়।

কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির আওতায় উদারীকরণের কারণে কৃষির মতো একটি অন্যতম জরুরি খাতে ভর্তুকিসহ বিশেষ সহায়তা কমায় উভয় ধরনের বাজেটীয় বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। ১৯৭১-৭২ অর্থবছরে যেখানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) আওতায় কৃষি খাতে সরকারের মূলধনী ব্যয় ছিল ৩১%, সেখানে তা কমতে কমতে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৩%-এরও নিচে নেমে এসেছে। তেমনিভাবে ১৯৯১ সালে যেখানে কৃষি খাতে সরকারের রাজস্ব ব্যয় ছিল ১০%, সেখানে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তা কমে ১.২%-এ নেমে আসে। এর অর্থ হল, কৃষি খাতে সরকারের ভর্তুকি প্রদান মারাত্মকভাবেই কমেছে।

লাভজনক না হওয়ার কারণগুলো

গবেষণায় প্রধান চারটি কারণ চিহ্নিত করা গেছে।

প্রথমত, ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির হারের তুলনায় উপকরণ খরচের হার বেড়েছে।

দ্বিতীয়ত, উৎপাদিত পণ্যের দাম বাড়ার হার উপকরণের দাম বাড়ার হারের চেয়ে কম হয়েছে।

তৃতীয়ত, উপকরণ ব্যয় বাড়ার হার অত্যন্ত উচ্চ ও দ্রুত হয়েছে বাজারবিরোধী তৎপরতায় (যেমন মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি, কালোবাজারি ও মজুদদারি)।

চতুর্থত, কৃষি উদারীকরণের কারণে বাজার এমনভাবে নিয়ন্ত্রণহীন করা হয়েছে যে বাজার থেকে উৎপাদকরা কম ও ব্যবসায়ীরা অধিক লাভ পেয়েছে। যেহেতু বাজারে ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণের কোনো ব্যবস্থা নেই, সেহেতু ব্যবসায়ীরা কৃষক তথা উৎপাদকদের কাছ থেকে তুলনামূলক কম দামে পণ্য কিনে নেয়। আর ব্যবসায়ীদেরই বাজারে সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে, যা উৎপাদকদের নেই।

অন্যদিকে বাজারে খুচরা ও পাইকারি বিক্রেতারা পারস্পরিক যোগসাজশে বিশেষত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রীর দাম কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে থাকে। সরকারের হাতে এই চক্র ভাঙার কোনো কার্যকর হাতিয়ার না থাকায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়েছে। এর প্রভাব আরো স্পষ্টভাবে দেখা যায় নিত্যদিনের বাজারে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক ঊর্ধ্বগতিতে। সাম্প্রতিক সময়ে এই পরিস্থিতি যে জটিল হয়েছে তার পেছনেও আছে কৃষি খাত উদারীরকরণের কুফল। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে চাহিদা-যোগানের মিথস্ক্রিয়ায় পণ্য-সামগ্রীর দাম নির্ধারিত হয়, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না–এসব তত্ত্বকথা বলে বিশ্বব্যাংকের কথিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ ট্রেডিং কর্পোরেশনসহ প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে ফেলায় প্রয়োজনের সময় সরকারের পক্ষে কার্যকরভাবে বাজারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হচ্ছে না।

বোঝাই যাচ্ছে যে কৃষি খাতের আয় ও লাভ কমে যাওয়ার বিষয়টি একাধারে জটিল ও বহুমুখী। তবে পুরোটাই বাংলাদেশের সরকারি তথা রাষ্ট্রীয় নীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশেষত গত দেড় দশকে বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক কৌশলে ক্রমান্বয়ে কৃষি বিষয়ক সবরকম সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা তুলে নেয়ার কাজ করা হয়েছে। যেমন স্বল্পমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ করার ক্ষেত্রে সরকারের অংশগ্রহণ সীমিত করা, খাদ্য ও কৃষি-সামগ্রীর আমদানি শুল্ক

সময়কাল	সংস্কারের খাত	গৃহীত পদক্ষেপ
৭০-র দশকের মাঝামাঝি	সার বিতরণ ব্যবস্থা	সনাতন বাজার ব্যবস্থার বদলে নতুন বাজর ব্যবস্থার উত্তরণ প্রক্রিয়া। পূর্ণ রাষ্ট্রীয় খাতের একচ্ছত্র ব্যবস্থা থেকে প্রতিযোগিতামূলক মুক্ত বাজারে প্রবেশ।
১৯৮২-৮৩	সারের মুল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া	প্রথমে এবং পরে ১৯৮৩ সালের এপ্রিলের মধ্যে সারাদেশে খামার পর্যায়ে দাম এককভাবে নির্ধারণ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়। বিএডিসির খুচরা বিক্রি করে দেয়া হয়।
১৯৮৪-৮৫	সার বিপণন বেসরকারিকরণ	১৯৮৫ সালের জুলাই মাসের মধ্যে বিএডিসি থানা পর্যায়ের প্রায় ৪২৩টি বিক্রয় কেন্দ্র বন্ধ করে দেয়। ১৯৮৮ সালের মাঝামাঝিতে এসে প্রায় ৮,০০০ পাইকার ও ডিলারকে প্রত্যাহার করা হয়।
মার্চ ১৯৮৯	কারখানা পর্যায় থেকে বেসরকারিভাবে সার সংগ্রহ	১৯৮৯ সালের ১৪ মার্চ থেকে সরকার পাঁচটি সার কারখানা থেকে সরাসরি ইউরিয়া বিপণনের অনুমতি দেয়। এছাড়া বন্দর ও কারখানা থেকে টিএসপি সংগ্রহেরও অনুমতি দেয়।
১৯৯২	বেসরকারিভাবে আমদানি অনুমোদন	সীমিত আমদানির তালিকা থেকে সারের নাম প্রত্যাহার করে ও বেসরকারিভাবে আমদানির অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে সারের ভর্তুকী পুরোপুরি তুলে নেয়া হয় এবং আমদানি ও বিপণন পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেয়া হয়।
১৯৯৫	ইউরিয়া বিতরণ ব্যবস্থা পরিবর্তন	অভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত ইউরিয়া সারের খোলাবাজার নীতি বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়ায় সরকার ইউরিয়া বিপণন ও বিতরণ ব্যবস্থা পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে যা এখনো বজায় আছে।

নির্বিচারে হ্রাস করা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে বিরাষ্ট্রীয়করণ, কৃষি ভর্তুকি প্রত্যাহার প্রভৃতি।

সে কারণেই ভরা মৌসুমে সারের জন্য হাহাকার যেন বাংলাদেশে নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী সার না পেয়ে কৃষকরা বিক্ষোভ, ঘেরাও, অনশন করছে। সার সংকটের প্রধান কারণ হলো মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য। ডিলারশিপের নামে মধ্যস্বত্বভোগী সার নিয়ে ব্যবসা করেছে, বাড়তি সময় ধরে গুদামে মজুদ রেখে দাম বাড়িয়েছে। ফলে চড়া দাম দিয়েও কৃষক সার পাচ্ছে না। সময়মতো সরবরাহের ব্যবস্থা না করে এখানে যে এক ধরনের কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয় তাও অনেকটা স্পষ্ট।

অথচ বছরের পর বছর সরকারিভাবে প্রচার করা হয়: "দেশে ক্রমবর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং সেই সাথে খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার ও টেকসই করার লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক কৃষিব্যবস্থার ওপর বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ; দেশের সর্বত্র মাঠপর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা নিশ্চিতকরণ; কৃষিঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজীকরণ; কৃষি খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি এবং গবেষণালব্ধ সমন্বিত প্রযুক্তি ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।" (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৬/পৃ:৬৮) সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাগুলো হ্রাস করার কারণে গরিব কৃষকরা বাজারে অনিশ্চয়তা ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ীদের চক্রে পতিত হয়েছে। বিশেষ করে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি হ্রাস করায় বিকল্প সহায়ক হিসেবে উপকরণ বাজার নিয়ন্ত্রণ করার কোনো কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের কৃষি খাত ও অর্থনীতি

শস্য ও শাক-সবজি এবং মৎস্যসম্পদ উপখাতের জোরালো প্রবৃদ্ধির ফলে বন্যার ক্ষতি কাটিয়ে কৃষি খাতে গতি সঞ্চারিত হয়, যার ফলে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ৪.৫% যা আগের ২০০৪-০৫ অর্থবছরে ছিল ২.২%। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে শস্য ও শাক-সবজি উপখাতে আগের মানে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের মাত্র ০.২% প্রবৃদ্ধির তুলনায় ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪.২% হারে প্রবৃদ্ধি ঘটে। আউশ, আমন ও বোরোর উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গত অর্থবছরে সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন ৪.৬% বেড়ে ২৭.৩ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অনুকূল আবহাওয়া, উচ্চ ফলনশীল জাত (HYV) বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহের কারণে দ্বিতীয় বৃহত্তম ফসল আমনের উৎপাদন ১০.২% বেড়ে ১০.৮ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। আর আমনের ভালো ফলন ও উৎপাদিত পণ্যের অধিক মূল্যের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে কৃষক পরবর্তী শস্য বোরো উৎপাদনে অক্লান্ত শ্রম প্রদান করে। সার ও ডিজেল জ্বালানির সরবরাহ কিছুটা ব্যাহত হওয়া

একক বৃহত্তম ফসল বোরোর উৎপাদন ১.৪% বৃদ্ধি পেয়ে ১৪.০ মিলিয়ন মেট্রিক টনে দাঁড়ায়। ভালো আবহাওয়া পরিস্থিতি, অধিক শস্যঋণ বিতরণ ও প্রত্যয়নকৃত বীজের বিপুল ব্যবহার অধিক বোরো উৎপাদনে সহায়তা করে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাবি করেছে। স্বল্প শীতকাল ও গম চাষ থেকে কৃষকরা ক্রমান্বয়ে ভুট্টা চাষে ঝুঁকে পড়ায় গমের আবাদের এলাকা কমে যাওয়ার কারণে আলোচ্য অর্থবছরে গমের উৎপাদন ০.৭ মিলিয়ন মেট্রিক টন প্রাক্কলন করা হয়, যা অর্থবছর ০৫-এর প্রকৃত উৎপাদনের তুলনায় ৩০.০% কম। স্বল্প উৎপাদন খরচ, উৎসাহব্যঞ্জক বিক্রয়মূল্য ও বিশেষত পোলট্রি খাদ্য হিসেবে ভুট্টার বর্ধিত দেশীয় চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষকরা অধিক জমি ভুট্টা চাষের আওতায় আনায় ভুট্টার ভালো ফলন অর্জিত হয়। ভুট্টার চাষাধীন জমি বৃদ্ধি পেয়ে দশমিক ১৪ মিলিয়ন হেক্টরে দাঁড়ায়। পোলট্রি ফার্মের সংখ্যা ও উৎপাদনের পরিমাণ অধিক হওয়ায় পশুসম্পদ উপখাতে ৬.৩% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। এ ছাড়া বনজসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি সামান্য বেড়ে ৫.২%-এ দাঁড়ায়। মূলত সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ মৎস্য উৎপাদন অধিক হওয়ায় মৎস্যসম্পদ উপখাতে প্রবৃদ্ধি ৩.৭% থেকে বেড়ে ৩.৯% হয়।

জিডিপির খাতভিত্তিক অবদানের অংশ থেকে পরিলতি হয় যে, শস্য ও শাক-সবজি উপখাতের অংশ (সার্বিক কৃষি খাতে যার অবদান ৫৬.০%) কমে ১২.২% হয়। বনজসম্পদ উপখাতের অবদান অপরিবর্তিত থাকলেও অন্যান্য উপখাতের অংশ যথা–পশুসম্পদ ও মৎস্যসম্পদ (যাদের অংশ অপোকৃত কম আকারের) সামান্য হ্রাস পায়।

কৃষিঋণ: কখনোই লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয় না

গত দুই দশকে কৃষিঋণ বিতরণ কখনোই লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারেনি বলে পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ সময়েই লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি পৌঁছেছে। এই প্রবণতাকে নয়া উদারবাদী অর্থনৈতিক কর্মকাঠামোর একটি নেতিবাচক প্রভাব বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। সর্বশেষ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৫,৮৯২ কোটি টাকার সমপরিমাণ কৃষিঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শেষ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৫,৪৯৬ কোটি টাকা।

বস্তুত কৃষি খাতে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহের অনীহার কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের কর্মসূচিভিত্তিক বার্ষিক ঋণ এখনো কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা পালন করে আসছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, "কৃষি খাতে

সময়কাল	সংস্কারের খাত	গৃহীত পদক্ষেপ
১৯৭৮-৭৯	সেঁচ উপকরণ ও যন্ত্রাদি আমদানিতে বেসরকারিখাতকে অনুমোদন ও এসবের বেসরকারিকরণ	বেসরকারিভাবে অগভীর নলকুপ আমদানি ও বিতরণ অনুমতি পায় নির্দিষ্ট মানদন্ড বজায় রাখা সাপেক্ষে। গভীর নলকূপ ও পানি উত্তোলন পাম্প ভাড়া দিয়ে ব্যবহার করার অনুমতি দেয়া হয়। একই সঙ্গে সমবায় ও ব্যক্তির কাছে এগুলো বিক্রর জন্য স্বল্প সুদে ঋণও প্রচলন করা হয়।
১৯৮৬	আমাদানি উদারীকরণ	সেঁচ যন্ত্রপাতি (ডিজেলচালিত মেশিন) আমদানি বেসরকারিখাতে ছাড়া হয় ১৯৮৬ সালে। নির্দিষ্ট ব্রান্ডের যন্ত্র আমাদানির বাধ্যবাধ্যকতাও তুলে নেয়া হয়।
১৯৮৮	সেঁচের ছোটখাট সব যন্ত্রপাতি আমদানির ওপর যাবতীয় সীমাবদ্ধতা প্রত্যাহার	বেসরকারিখাতে অবাধ আমদানি অনুমোদন ও শুল্ক প্রত্যাহার। মান বজায় রাখার ব্যধ্যবাধ্যকতা পুরোপুরি তুলে নেয়া হয়।

সারণী-বিভিন্ন ফসলের প্রাপ্তি-ব্যয় অনুপাত

বছর / শস্য	১৯৮১-৮২	১৯৮৬-৮৭	১৯৯১-৯২	১৯৯৬-৯৭	২০০১-২০০২	২০০৫-২০০৬
আউশ (দেশীয়)	০.৯৬	১.০৪	১.০৯	০.৬৬	০.৭৬	০.৬২
আউশ (উফশী)	১.২৮	১.৩৩	১.৩৬	০.৮২	০.৭৬	০.৮১
আমন (এলটি)	১.৪৯	১.৮৫	১.৪৮	১.০৬	১.০৬	০.৯৬
আমন (এম)	১.৪৬	১.৭৯	১.৬৫	১.০৯	১.২৭	০.৯৯
বোরো (এলটি)	১.২২	১.১৩	০.৯৮	০.৬৫	০.৮৩	০.৭০
বোরো (এম)	১.৪৪	১.৬৯	১.৩২	০.৯৮	১.০২	০.৮৯
গম (এম)	১.৩৩	১.১৪	১.১৬	১.০৯	১.০৪	১.০৭

অব্যাহতভাবে প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্দেশনা সম্বলিত কর্মসূচিভিত্তিক বার্ষিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। ঋণের সম্ভাব্য চাহিদা, বিগত বছরসমূহের প্রকৃত বিতরণ ও অর্থের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিবেচনায় রেখে ঋণদানকারী ব্যাংকসমূহ তাদের বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে।" (বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫-০৬) দেশে এককভাবে সবচেয়ে বেশি কৃষিঋণ বিতরণ করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক। তারপর সমষ্টিগতভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো। এরপর রয়েছে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড। তবে গত অর্থবছরে একমাত্র রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকই ঋণ বিতরণে ল্যমাত্রা অর্জন করতে পেরেছে। এদিকে কৃষিঋণের জন্য ব্যাংকগুলোকে পুনঃঅর্থায়ন করার যে ব্যবস্থা ছিল তার পরিমাণ বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক কমিয়ে এনেছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাকাবকে যথাক্রমে ৫০০ কোটি ও ২৩৬ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে শুধু রাকাবকে ১৪৩ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন করা হয়েছে।

কৃষিঋণ বিতরণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নিজস্ব তহবিলের ভিত্তি বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক দিন ধরেই তাদের বকেয়া আদায় বাড়ানোর জন্য তাগিদ দিয়ে আসছে। ব্যাংকগুলোর নিজস্ব প্রয়াস জোরদার করতেই পুনঃঅর্থায়ন ক্রমান্বয়ে কমিয়ে দেয়া হচ্ছে বলেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। বাস্তবতা হলো, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থার চাপে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এই কাজটি করতে হয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান অনুসারে, গত অর্থবছরে মোট বিতরণকৃত কৃষিঋণের ৪০% গেছে শস্য খাতে। আর ২৮ শতাংশ ব্যবহৃত হয়েছে দারিদ্র্য বিমোচন উপখাতে। তবে ঋণ বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে কৃষিজাত পণ্য বিপণন উপখাতে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে এই উপখাত মোট বিতরণকৃত কৃষিঋণের মাত্র ১% পেয়েছিল, যেখানে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এই উপখাত পেয়েছে ১৪%। প্রধানত শস্যঋণ, সেচ-যন্ত্রপাতি ক্রয়, গবাদিপশু, মৎস্য ও অন্যান্য কৃষি কর্মকাণ্ড খাতসমূহে ঋণ বিতরণে ল্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় সামগ্রিক ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হয়। অপরপক্ষে, কৃষিপণ্য বিপণন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ উভয় খাতের বিতরণ অর্থবছর ০৬-এও লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে। যাহোক, শস্যঋণ, সেচ-যন্ত্রপাতি ক্রয়, মৎস্য ও দারিদ্র্য দূরীকরণ খাতে ঋণ বিতরণ বিগত বছরের প্রকৃত বিতরণের তুলনায় বেশি ছিল।

কৃষি ও পলিঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে দুটি বিশেষায়িত ব্যাংক যথা–বিকেবি ও রাকাব, চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিআরডিবি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বেসরকারি ব্যাংকসমূহ মাত্র ৩৩৪ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে, যা অর্থবছরে মোট বিতরণকৃত ৫,৪৯৬ কোটি টাকার কৃষিঋণের অতিরিক্ত। এ প্রসঙ্গে খোদ বাংলাদেশ ব্যাংকই বলেছে, "কৃষি ও গ্রামীণ অর্থায়নে ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা, প্রয়োজনীয় জনবলের স্বল্পতা, তদারকি ও পরিবীণ কার্যক্রম পরিচালনার অধিক ব্যয়, তথ্যের অপর্যাপ্ততা বা মক্কেল/ঋণগ্রহীতা সম্পর্কে ভুল তথ্য বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকগুলোকে কৃষি/পল্লিঋণ প্রদানে নিরুৎসাহিত করেছে। যেহেতু কৃষিভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তাই উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিরসন করে এই ব্যাংকগুলোকে তাদের ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় এ খাতকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

"আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণ/IFI Watch, উন্নয়ন অন্বেষণ–দি ইনোভেটরস্ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত। মূল তত্ত্বাবধায়ক: রাশেদ আল মাহমুদ তিতুমীর। তামিম আসজাদ রচিত রাশেদ আল মাহমদু তিতুমীর ও গোলাম সারওয়ার প্রণীত *Failing Farmers: Liberalisation in Agriculture and Farmers' Profitability in Bangladesh*-কে মূল ভিত্তি ধরে চলতি সংখ্যাটির বাংলা সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছে। উন্নয়ন অন্বেষণের পক্ষে এটি প্রকাশ করেছেন নজরুল ইসলাম, সদস্য-সচিব।

আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষণের ইংরেজি সংস্করণসহ অন্যান্য প্রতিবেদন পাওয়া যাবে: *www.unnayan.org*। বেশির ভাগ প্রতিবেদনই ডাউনলোডযোগ্য।

চলতি সংখ্যাটি নিজেরা করি ও উন্নয়ন অন্বেষণের যৌথ কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রকাশিত।

নিজেরা করি
Nijera kori

The Nijera Kori is a continuous and diverse movement focusing on social mobilisation and ensuring accountable democratic structures, targeting the most marginalised groups through the development of autonomous landless organisations with an emphasis on gender equity.

উন্নয়ন অন্বেষণ
Unnayan Onneshan
The Innovators
centre for research and action on development

The Unnayan Onneshan-The Innovators, an independent not-for-profit registered trust, aims to contribute to innovation in development through research, advocacy, solidarity and action. The alternative public policy watchdog was established in 2003 by a group of university faculties and development professionals across Bangladesh to contribute to the search for solutions to endemic poverty, injustice, gender inequality and environmental degradation at the local, national and global levels. The philosophy and models of the centre for research and action focus on pluralistic, participatory and sustainable development and seek to challenge the narrow theoretical and policy approaches derived from unitary models of development.